What is caste system? Discuss its different chatrectristics.

‘জাতি’ শব্দটি স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ শব্দ ‘কাস্টা’ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ‘জাতি, বংশ বা প্রজাতি’। পর্তুগিজরা আধুনিক অর্থে ‘কাস্টা’ শব্দটি ব্যবহার করেছিল, যখন তারা ভারতের ‘জাতি’ নামক বংশানুক্রমিক ভারতীয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করে। ‘জাতি’ শব্দটি ‘জন’ মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জন্ম গ্রহণ করা। সুতরাং, বর্ণ প্রথা জন্মের সাথে সম্পর্কিত।

অ্যান্ডারসন এবং পার্কারের মতে, “বর্ণ হলো সামাজিক শ্রেণি সংগঠনের এমন একটি চরম রূপ, যেখানে মর্যাদা শ্রেণিবিন্যাসে ব্যক্তিদের অবস্থান বংশ এবং জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়।”

জাতিকে একটি বংশানুক্রমিক, অন্তর্বিবাহী গোষ্ঠী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যার একটি সাধারণ নাম, সাধারণ ঐতিহ্যবাহী পেশা এবং সাধারণ সংস্কৃতি রয়েছে, যা গতিশীলতা এবং মর্যাদার স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনমনীয় এবং একটি একক সমজাতীয় সম্প্রদায় গঠন করে।

জাতিভেদ প্রথা হলো ভারতের একটি সামাজিক স্তরবিন্যাস, যা মূলত একজন ব্যক্তির পেশা এবং জন্মের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এটি সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে, যাদের জাতি বলা হয়, এবং এই জাতিগুলো আবার উপজাতিতে বিভক্ত।

চারটি বর্ণ – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হলো হিন্দু সমাজের চারটি ধ্রুপদী বিভাগ। তবে, বাস্তবে এই বর্ণগুলোর সর্বদা অনেক উপবিভাগ (জাতি) ছিল, যা বর্তমানে ভারতে জাতি (জাতি) বোঝায়।

নিম্নে জাতিভেদ প্রথার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলঃ

1) সমাজের খণ্ডভিত্তিক বিভাজন**:** সমাজ বিভিন্ন ছোট ছোট সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত, যাদেরকে জাতি বা বর্ণ বলা হয়। এই প্রতিটি জাতিই একটি সুগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যার সদস্যপদ জন্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

2) ক্রমবিন্যাস**:** লুই ডুমোঁর মতে, জাতিপ্রথা আমাদের ক্রমবিন্যাসের একটি মৌলিক সামাজিক নীতি শেখায়। এই ক্রমবিন্যাসের শীর্ষে রয়েছে ব্রাহ্মণ জাতি এবং সর্বনিম্নে রয়েছে অস্পৃশ্য জাতি। এর মাঝে রয়েছে মধ্যবর্তী জাতিগুলো, যাদের আপেক্ষিক অবস্থান সবসময় স্পষ্ট নয়।

3) অন্তর্বিবাহ**:** অন্তর্বিবাহ হলো জাতিপ্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ একটি জাতি বা উপজাতির সদস্যদের অবশ্যই নিজেদের জাতি বা উপজাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হবে। অন্তর্বিবাহের নিয়ম লঙ্ঘনের অর্থ হলো সমাজচ্যুতি এবং জাতিচ্যুত হওয়া। তবে, অনুলোম বিবাহ (যেখানে নারীরা নিজেদের চেয়ে ধনী বা উচ্চ জাতি বা সামাজিক মর্যাদার কাউকে বিয়ে করে) এবং প্রতিলোম বিবাহও (নিম্ন সামাজিক মর্যাদার ব্যক্তির সাথে বিবাহ) প্রচলিত ছিল। প্রতিটি জাতিতে গোত্র বহিঃবিবাহও বজায় রাখা হয়। প্রতিটি জাতি গোত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন ছোট ছোট এককে বিভক্ত।

একটি গোত্রের সদস্যদেরকে একজন সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশধর বলে মনে করা হয়—তাই একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

4) বংশগত মর্যাদা এবং পেশা: খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালে ভারতে আসা গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস জাতিপ্রথার দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হিসেবে বংশগত পেশার কথা উল্লেখ করেছেন, অন্যটি হলো অন্তর্বিবাহ।

5) খাবার ও পানীয়ের উপর বিধিনিষেধ: সাধারণত কোনো জাতি নিজেদের চেয়ে সামাজিক স্তরে নিম্ন কোনো জাতির কাছ থেকে রান্না করা খাবার গ্রহণ করত না, দূষিত হওয়ার ধারণার কারণে। খাবারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবুও ছিল। রান্নার ট্যাবু, যা নির্ধারণ করে কে খাবার রান্না করতে পারবে। খাওয়ার ট্যাবু, যা খাবার গ্রহণের সময় অনুসরণীয় আচার-অনুষ্ঠান নির্ধারণ করে। সহভোজনের ট্যাবু, যা নির্ধারণ করে কার সাথে খাবার খাওয়া যাবে। সবশেষে, যে ট্যাবুটি পান করা বা রান্নার জন্য ব্যবহৃত পাত্রের প্রকৃতির (মাটি, তামা বা পিতলের তৈরি) সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ: উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণরা নিজেদের চেয়ে নিম্ন কয়েকটি জাতির কাছ থেকে শুধুমাত্র পাকা খাবার (ঘি-তে রান্না করা) গ্রহণ করত। তবে, কোনো ব্যক্তিই নিম্ন জাতির দ্বারা প্রস্তুত কাঁচা খাবার (জলে রান্না করা) গ্রহণ করত না। ব্রাহ্মণদের তৈরি খাবার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, আর একারণেই দীর্ঘদিন ধরে হোটেল শিল্পে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল। হরিজন ছাড়া অন্য কোনো বর্ণের জন্য গরুর মাংস খাওয়া অনুমোদিত ছিল না।

6) একটি নির্দিষ্ট নাম: প্রতিটি বর্ণের একটি নির্দিষ্ট নাম আছে যার মাধ্যমে আমরা এটিকে শনাক্ত করতে পারি। কখনও কখনও, একটি পেশাও একটি নির্দিষ্ট বর্ণের সাথে যুক্ত থাকে।

7) পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণা: উচ্চ বর্ণের লোকেরা আচারগত, আধ্যাত্মিক এবং জাতিগত পবিত্রতার দাবি করত, যা তারা অপবিত্রতার ধারণার মাধ্যমে নিম্ন বর্ণের লোকদের দূরে রেখে বজায় রাখত। অপবিত্রতার ধারণাটির অর্থ হলো, নিম্ন বর্ণের মানুষের স্পর্শ উচ্চ বর্ণের মানুষকে অপবিত্র বা কলুষিত করবে। এমনকি তার ছায়াও উচ্চ বর্ণের মানুষকে অপবিত্র করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হতো।

8) জাতি পঞ্চায়েত: প্রতিটি বর্ণের মর্যাদা কেবল জাতিগত আইন দ্বারাই নয়, প্রথা দ্বারাও সতর্কতার সাথে সুরক্ষিত থাকে। এই নিয়মগুলো একটি শাসন সংস্থা বা বোর্ডের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রকাশ্যে প্রয়োগ করা হয়, যাকে জাতি পঞ্চায়েত বলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল এবং বর্ণের এই পঞ্চায়েতগুলোর নির্দিষ্ট নাম রয়েছে, যেমন মধ্যপ্রদেশে কুলদ্রিয়া এবং দক্ষিণ রাজস্থানে জোখিলা।

Changes of caste system in India

ভারতের জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি

ভারতের জাতিভেদ প্রথা সময়ের সাথে সাথে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। জাতিব্যবস্থার পরিবর্তনে তিন ধরনের পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত, যেমন কাঠামোগত পরিবর্তন, কার্যকারিতামূলক পরিবর্তন এবং মনোভাবগত পরিবর্তন।

কাঠামোগত পরিবর্তন:

(i) ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের পতন:

সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যে তীব্র পতন ঘটেছে। অতীতে, ব্রাহ্মণরা জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করত। কিন্তু আজ আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য পটভূমিতে চলে গেছে। তারা আর সেই সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে না, যা তারা একসময় করত।

(ii) জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসের পরিবর্তন:

জাতিব্যবস্থা আর শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সজ্জিত জাতিগোষ্ঠীর একটি স্পষ্টভাবে বিভক্ত ব্যবস্থা নয়। পেশাগত বৈচিত্র্য, শহরাঞ্চলে অভিবাসন, কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদির মতো কিছু কারণের ফলে জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার সীমানা অস্পষ্ট বা ভেঙে যাচ্ছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী, শ্রেণি এবং বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণের মাত্রা বাড়ছে। জাতি, শ্রেণি এবং ক্ষমতার মধ্যেকার সঙ্গতির একটি ক্রমান্বয়িক হ্রাস দৃশ্যমান।

(iii) হরিজনদের সুরক্ষা:

সুরক্ষামূলক বৈষম্যের সরকারি নীতি হরিজনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে অনেক দূর এগিয়েছে। ফলস্বরূপ, তাদের সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়েছে।

কার্যকারিতামূলক পরিবর্তন:

(i) মর্যাদা নির্ধারণে পরিবর্তন:

একটি জাতিভিত্তিক সমাজে, জন্মকে সামাজিক মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে, জন্ম আর সামাজিক প্রতিপত্তির ভিত্তি নয়। সম্পদ, যোগ্যতা, শিক্ষা, দক্ষতা ইত্যাদির মতো মানদণ্ডগুলো সামাজিক মর্যাদার নির্ধারক হয়ে উঠেছে। মর্যাদা নির্ধারণকারী হিসেবে জাতির গুরুত্ব পটভূমিতে চলে গেছে।

(ii) পেশার ক্ষেত্রে পরিবর্তন:

জাতিব্যবস্থার ক্ষেত্রে, ব্যক্তির তার জাতি দ্বারা নির্ধারিত পেশা অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আজ পেশা আর কোনো জাতির বংশগত একচেটিয়া অধিকার নয়। একজন ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী যেকোনো পেশা বেছে নিতে স্বাধীন। মহাত্মা গান্ধীর শ্রমের

মর্যাদার আন্দোলন উচ্চবর্ণের মানুষদের কায়িক শ্রমের কাজে আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে শিক্ষা নিম্নবর্ণের সদস্যদের জন্য শ্বেত-কলার পেশার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

(iii) বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের পরিবর্তন:

জাতিভেদ প্রথায় স্বগোত্র বিবাহ ছিল সঙ্গী নির্বাচনের ভিত্তি। একটি জাতি বা উপজাতির সদস্যদের একটি অলঙ্ঘনীয় সামাজিক আইন দ্বারা গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ এবং হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ স্বগোত্র বিবাহের বিধিনিষেধ দূর করেছে এবং আন্তঃবর্ণ বিবাহকে আইনত বৈধ ঘোষণা করেছে।

সাম্প্রতিককালে, পশ্চিমা দর্শনের প্রভাব, সহশিক্ষা, একই কারখানা বা অফিসে বিভিন্ন বর্ণের পুরুষ ও মহিলাদের একসাথে কাজ করা সহ বেশ কয়েকটি কারণ আন্তঃবর্ণ বিবাহ, প্রেম বিবাহ এবং দেরিতে বিবাহের ঘটনা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

(iv) সহভোজনের পরিবর্তন:

ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থায়, সহভোজনের এককটি জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বেশ কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে, এই এককটির ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ ঘটেছে। আজ, ব্রাহ্মণরা 'শুদ্ধ' শূদ্রদের সাথে একসাথে খাবার খাচ্ছেন। তারা অন্যান্য শুদ্ধ জাতিদের কাছ থেকে কাঁচা খাবার নিতে দ্বিধা করেন না। উপরন্তু, তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিম্নবর্ণের সদস্যদের কাছ থেকে খাবার ও জল গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন না।

(v) পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণার পরিবর্তন:

কাপাদিয়া বলেছেন যে, এই শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্ত হিন্দু পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণাটি তার পরিধির দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক এবং পালনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল। জাতিভেদ প্রথায় পেশাগুলোকে তাদের আচারগত পবিত্রতা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, একজন নাপিতের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিকে অপবিত্র বলে মনে করা হতো। মাংস, মাছ, মদ ইত্যাদি আচারগতভাবে অপবিত্র বলে বিবেচিত হতো।ঋতুকালীন নারীকে অপবিত্র বলে মনে করা হতো এবং সেই কারণে তার রান্না করা খাবারও অপবিত্র বলে বিবেচিত হতো। একবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সামাজিক জীবনে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার এই ধারণাগুলোর গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ধর্মীয় অনুমোদন আর শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বিভক্তি হিসেবে কাজ করে না। বর্তমানে স্বাস্থ্যবিধির নিয়মকানুনই পবিত্র ও অপবিত্রের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করছে।

(vi) জীবনযাত্রার পরিবর্তন:

অতীতে প্রতিটি জাতির নিজস্ব জীবনধারা ছিল। জীবনযাত্রার এই পার্থক্যই বিভিন্ন জাতির মানুষকে একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। কিন্তু আজ জাতিগুলোর জীবনযাত্রার মধ্যেকার পার্থক্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে এবং একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

(viii) জাতি পঞ্চায়েতের ক্ষমতার পরিবর্তন:

জাতি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, প্রতিটি জাতির নিজস্ব একটি জাতি পঞ্চায়েত ছিল। জাতি পঞ্চায়েত একটি বিচার বিভাগীয় সংস্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করত। কিন্তু বর্তমানে জাতি পঞ্চায়েতগুলো বিলুপ্তির পথে। আদালত এবং গ্রামের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাদের বেশিরভাগ ভূমিকা দখল করে নিয়েছে।

(ix) শিক্ষার উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার:

আজ শিক্ষা আর উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যেকোনো জাতের যেকোনো ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে পারে। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্তরের সরকার নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৃত্তি, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে অধ্যয়নের উপকরণ, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

(x) ক্ষমতা ব্যবস্থায় পরিবর্তন:

গণতন্ত্র এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ধারণা জাতি ব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা শ্রেণিবিন্যাসের মূলে আঘাত হানে। অতীতে রাজনীতিকে উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার বলে মনে করা হতো। কিন্তু আজ সব জাতের মানুষ সচেতন হচ্ছে যে তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

(xi) জাতি চেতনার বৃদ্ধি:

জাতিভেদ প্রথা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি রাজনৈতিক বিষয় এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে।

(xii) যজমানি ব্যবস্থার দুর্বলতা:

গ্রামাঞ্চলে যজমানি ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে, যা আন্তঃজাতি সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন জাতের সদস্যদের দ্বারা আচার-অনুষ্ঠান পালনে শিথিলতা, ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের পতন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আন্তঃপ্রজন্মীয় শিক্ষাগত গতিশীলতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণকে গ্রামীণ ভারতে যজমানি ব্যবস্থার পতনের জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

মনোভাবগত পরিবর্তন:

(i) আরোপিত মর্যাদার উপর আস্থার অভাব:

শিল্পায়ন, নগরায়ন, পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফলে ভারতীয় সমাজে যে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে, তার প্রভাবে জাতি ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে।

তারা কেবল জন্মের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট মর্যাদা মেনে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। তারা যোগ্যতা, দক্ষতা, প্রতিভা এবং প্রবণতাকে গুরুত্ব দেয়। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা অর্জিত মর্যাদার উপর আস্থা রাখে। ফলস্বরূপ, জাতি ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই ভেঙে গেছে।

(ii) দার্শনিক ভিত্তির পরিবর্তন:

এম. এন. শ্রীনিবাসের মতে, কর্মফল এবং আত্মার পুনর্জন্মের মতবাদই জনগণের দ্বারা জাতিভেদ প্রথাকে মেনে নেওয়ার জন্য দায়ী। কিন্তু বর্তমানে জাতিভেদ প্রথার প্রতি এমন মনোভাব আর নেই। মানুষ বিশ্বাস করে না যে জাতিভেদ প্রথা ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত। তারা জাতিভেদ প্রথার দার্শনিক ভিত্তি নিয়েই সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

পরিশেষে, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ এই নয় যে এটি অন্তর্নিহিতভাবে ত্রুটিপূর্ণ, বরং এটি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ধ্যানধারণার সাথে সম্পূর্ণবেমানান। শিল্পায়ন, নগরায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আধুনিকায়ন জাতিভেদ প্রথায় উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো এনেছে। এম. এন. শ্রীনিবাস যথার্থই বলেছেন যে, আধুনিক ভারতে জাতিভেদ প্রথা একটি নতুন রূপ ধারণ করেছে।